তখন ও এখন

গীতা দাস

(৬)

ব্যাগে নয় – বড় বড় সুটকেসে সবার কাপড় চোপড় ভরে বেড়াতে যেতাম। সে সুটকেস এত ভারি হত যে টানতে কুলি লাগত। বেড়াতে বলতে দু'এক বছরে একবার মামার বাড়ি যাওয়া। দূরে। চাঁদপুর জেলার মতলবে। মতলব। আ-কার হ্রস্ব ই-কার ছাড়া শব্দ। এ নিয়ে কাকারা আমার মাকে খেপাতেন। এমনিতে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সব কাছাকাছি ছিল। সকালে গেলে বিকেলে ফিরে আসতাম বা দু'একদিন থাকলে চামড়ার ব্যাগে করে কাপড় চোপড় নিতাম। আশে পাশের প্রতিবেশিদের --- যারা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছিল তাদেরকে দেখতাম গাট্টি বেঁধে কাপড় চোপড় নিয়ে বেড়াতে যেতে। একটা বড় কাপড় দু'ভাঁজ করে অন্যান্য কাপড় চোপড় ভরে চারটি কোণার আড়াআড়িভাবে দুটো কোণা বিশেষ কায়দায় গিট্টু দিয়ে গাট্টি বাঁধত। এখনো ভ্রমণের সময় আমি রাস্তাঘাটে গাট্টি খুঁজি। পাই না। গরীব হলেও পলিথিন বা কাপড়ের ব্যাগে কাপড় চোপড় নিয়ে যায়। গাট্টির অস্তিত্ব বলতে গেলে বিলোপ হয়ে গেছে।

তবে হ্যাঁ, আমার এক সহকর্মীর আপত্তি সত্বেও আমি কিন্তু প্রায়ই গাট্টি বাঁধি। কীভাবে? অফিসে টিফিন বক্সে দুপুরের খাবার নিতে হয়। মাঝে মাঝে হটপটে নিই। তবে বেশিরভাগ সময়ই ষ্টীলের বা প্লাষ্টিকের বক্সে। দু'তিনটি বক্স একটি বড় রুমাল দিয়ে চারটি কোণার আড়াআড়িভাবে দুটো কোণা বিশেষ কায়দায় গিট্টু দিয়ে বেঁধে নিই। ছোটবেলায় পাশের বাড়ির বিধুর মায়ের কাছ থেকে শেখা বিদ্যাটি কাজে লাগাই। এ গিট্টু শিখতে গার্ল গাইডের গিট্টু শেখার মতই সময় ব্যয় করেছিলাম।

আমার সহকর্মীটির আপত্তির কারণ বক্সগুলোতো সুন্দর – বাহারী ব্যাগে করেই আনি। তাহলে আবার রুমালে গাট্টি বাঁধি কেন? আসলে রুমালে গিট্টু দিয়ে বেঁধে আনলে বক্সের মুখ খুলে খাবার পড়ে যাবার ঝুঁকি থাকে না। বিষয়টি অবশ্য আমি তাকে ভাঙ্গিয়ে বলি না। ওর আপত্তি উচ্চ মার্গে উঠতে দেই।

সহকর্মীটি একদিন বলেই বসল --- এ যে দেখছি গ্রামের মানুষকেও হার মানাবেন।

আমি হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছি --- আমি তো গ্রামেরই। বড়বেলায় শহুরে হয়েছি।
তাছাড়া ছোটবেলায় দেখেছি যারা দিন মজুরি খাটতে আসত তারা বোল, সানকি, বাটিতে দুপুরের খাবার গামছা দিয়ে এভাবেই বেঁধে আনত। কিছুদিন আগেও আমার শ্বশুর বাড়ির গ্রামে গিয়ে এ ব্যবস্থাটি দেখেছি অক্ষুণ্ন অবস্থায় রয়েছে। যারা ক্ষেতে কামলা দিতে আসে তাদের খাবার এখনো এভাবেই বেঁধে আনে। দিনমজুরের ব্যবস্থাটি মাসমজুরি খাটা আমিও না হয় অনুসরণ করলামই!

শহুরে হওয়া --- ঢাকাইয়া হওয়া নিয়েও রয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ঢাকায় জন্ম ও বেড়ে উঠা ছেলেরা ঢাকার বাইরে থেকে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা নিজেদের ক্লাসের ছেলেদের বলে ইন্টার ডিস্ট্রিক ফরেনার। অর্থাৎ মফস্বলের। সে দিক থেকে ঢাকায় জন্ম ও বেড়ে উঠা ছেলেদের মা বাবারাও যে ইন্টার ডিস্ট্রিক ফরেনার তা তারা ভুলে যায় বা জানে না অথবা তলিয়ে দেখে না।

আমিও সেদিক থেকে ঢাকায় ইন্টার ডিস্ট্রিক ফরেনার। ইন্টার ডিস্ট্রিক ফরেনাররাই এখনো এ শহরে রাজা, উজির, নাজির ও কতোয়াল। তখন বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে ইন্টার ডিস্ট্রিক ফরেনাররাই এগিয়ে থাকত।

এখন মাথা মোটা নীতি নির্ধারণ। ঢাকা সব কিছুরই কেন্দ্রবিন্দু। ভাল লেখাপড়া। ভাল ফলাফল। ভাল চাকরি। ভাল চিকিৎসা। ভাল ব্যবসা। কী নয়? আর কিছুদিন পরে ইন্টার ডিস্ট্রিক ফরেনাররা আর কোন কিছুতেই সুযোগ পাব না।

তবে ভাল ভাল ভারির ভারে ---- বোঝায় ঢাকা ডেবে যাচ্ছে আর সারা দেশ ধ্বসে যাচ্ছে। এ বিষয়টি ঢাকার রাজা, উজির, নাজির ও কতোয়ালরা বুঝেন না --- যারা নিজেরাও ঢাকায় ইন্টার ডিস্ট্রিক ফরেনার ছিলেন।

আমি ছোটবেলায় ঢাকায় মাসিমার বাসায় অনেক বেড়াতে এসেছি। থেকেছি। বাবার সাথে ঘুরেছি। তবে ঐটাকে ঢাকায় আসা বুঝাচ্ছি না। প্রথম যখন ঢাকায় পড়তে আসি তখন কিন্তু সামসুন্নাহার হলে আমার অবস্থা অনেক বিষয়ে ইন্টার ডিস্ট্রিক ফরেনারেরই ছিল। যেমন ---মফস্বলীয় খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে পারিনি। সকালে ভাত খেতাম। হলে

বেআইনীভাবে বৈদ্যুতিক হিটার জ্বালিয়ে সকালে ভাত রাঁধতাম। সকালে হলে ভাত পাওয়া যেত না। হাউজ টিউটর রেবু আপার ভয়ে কাঁপলেও হিটারে ভাত রান্না বন্ধ করিনি। কতবার হিটার সিজ হয়েছে !

পরে নব্বইয়ের দশকে মফস্বলের চাকরি পরিবর্তন করে ঢাকায় আসি। তখনও সকালে ভাত খেতাম। আমার সহকর্মীরা আমার সকালে ভাত খাওয়ার খবরে আৎকে উঠেছিল। বহু কষ্টে সকালে ভাত খাওয়া ছেড়েছি। ছেড়েছি ওজন কমিয়ে সুস্থ থাকার জন্য। গ্রামের মানুষ তিন বেলা পেট ঠেসে ভাত খেলেও মুটিয়ে যায় না। ওজন বাড়ে না তাদের পরিশ্রমী জীবনাচারের জন্য।

আমার ছেলেমেয়ে দু'জনেই সকালে এখনও ভাত খেয়ে অভ্যস্ত। তাদের বন্ধুরাও এ খবরে নিশ্চয়ই অবাক হয়!

আসলে সকালে ভাত খেয়ে বড় হয়েছি। গরীবরা সকালে রুটি খায় এমন মজ্জাগত ধারণা মগজে ঢুকেছিল। তখন আটা ও চালের দামে বিস্তর পার্থক্য ছিল। আমাদের নরসিংদীতে --- মফস্বলে আমার ছোটবেলায় আশেপাশের অসচ্ছল পরিবারে সকালে রুটি খেত।

এখন আটা ও চালের দাম সমানে সমান। আমার দাদু মগের মুল্লুকের গল্প বলতেন। মগের মুল্লুক মানে যে রাজ্যে যাচ্ছেতাই অবস্থা বিরাজমান। বোকার রাজ্য। যে রাজ্যে --- যে দেশে তেল ও ঘিয়ের দাম সমান। আমরাও এখন মগের মুল্লুকে না হলেও ঠকের রাজ্যে বাস করি যে রাজ্যে আটা ও চালের দাম সমানে সমান।

ছোটবেলায় শুনতাম মসুরি ডাল গরীবদের মাংস। পাতলা মসুরি ডাল খেয়ে কিছু প্রোটিন খেয়েছে বলে অনেকে তৃপ্তি পেত। ঠকের রাজ্যে এখন মসুরি ডালের পালেও ঝড়ো হাওয়া।

আমার আরেক সহকর্মী আমার আরেকটি আচরণ পছন্দ করে না। আমি রুমাল ব্যবহার করি। সহকর্মীটি ব্যাগে ছোট টিস্যুর প্যাকেট রাখে। কোন সভায় গেলে আমি টিস্যু যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলি। আমার রুমালই সম্বল। আমার সহকর্মীটির মতে যেখানে সেখানে নাকি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে ব্যবহার করা শোভন নয়। চৌকষ আচরণের লক্ষণ হল --- বক্স থেকে টিস্যু নেয়া--- মোছা--- ফেলে দেয়া। যা আমি চর্চা করি না।

২০০৫ সালে ‘কানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন’ এর বৃত্তি নিয়ে (অধুনা Equitas) মানবাধিকারের উপরে তিন সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করতে মন্ট্রিয়েলে গিয়েছিলাম। ঐ কোর্সের প্রথম দিনই অংক কষে অবহিত করা হয় এককালীন ব্যবহারযোগ্য চায়ের গ্লাস সব অংশগ্রহণকারীরা প্রতিবেলা প্রতিজন ব্যবহার করলে পরিবেশে কীরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। পাশাপাশি সাশ্রয়ী মূল্যের চায়ের মগ কিনে তা ব্যবহার করার ব্যবস্থাও রেখেছিল। প্রথমদিনই একটি মগ কিনে তিন সপ্তাহ ধরে সারাক্ষণ বয়ে বেড়িয়েছি। আর একটি রুমাল তো কোন ছাড়!

শোভনীয় বা অশোভনীয়তার আপেক্ষিকতার চেয়ে রুমাল ব্যবহার পরিবেশ বান্ধবও তো বটে!

বাঙালীর পুর্ব প্রজন্ম তো কাঁধে গামছা নিয়ে চলার চর্চায় অভ্যস্ত ছিল। এখনো গ্রামে-গঞ্জে এ চিত্র বিরাজমান। আমার ব্যাগ থেকে রুমাল বের করার সাথে কী কাঁধের গামছার সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়ে সহকর্মীটি অস্বস্তি বোধ করেন! হয়তো বা। আমি কিন্তু নিজেকে পরিবেশ বান্ধব বলে স্বস্তি বোধ করি। তৃপ্তি বোধ করি।

ছোটবেলায় দেখেছি কোথাও গেলে আমার ঠাকুমাদের হাতে একটি রুমাল থাকত। রুমালে পথের খরচ টাকা-পয়সা বেঁধে নিয়ে যেতেন। আমার এ চর্চায় তাদের প্রভাব রয়েছে ভেবে উত্তরাধিকারের অহংকারে স্ফীত হই বৈকি।

□□□□ □□□
ঢাকা
২ বৈশাখ/১৪১৫/১৫ এপ্রিল ২০০৮
grdas2006@yahoo.com
চলবে